স্বাধীনতা ৭৫

ছোটোদের গল্পবার্ষিকী

ঝালাপালা

১৪২৯

সম্পাদক

অশোককুমার মিত্র

প্রচ্ছদ

প্রদীপকুমার ভট্টাচার্য

অলংকরণ

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, ইন্দ্রনীল ঘোষ, শংকর বসাক, শমীন্দ্র ভৌমিক, প্রণব হাজরা, দীপাঞ্জন বসু

পুনশ্চ

ঝালা পালা

১৯৪৭ এর ১৫ আগস্ট।

দিল্লীর ভাইসরয় গভর্নর জেনারেলের ভবনসহ ভারতের সর্বত্র সকল সরকারি ভবন থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক ইউনিয়ন জ্যাক অপসারিত হয়ে আকাশে উড়ল তেরঙা পতাকা-ঘোষণা করল দ্বিশতাব্দী ব্যাপী স্বাধীনতা হীনতা-অবমাননার অবসান।

দুশো বছর আগে এক গভীর ষড়যন্ত্রের পরিণতিতে এবং কিছুটা ভাগ্য বিপর্যয়ে ও পেশাদারিত্বের অভাবে পলাশির যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিল শত সহস্র মানুষের অবিরত সংগ্রামের অভিঘাতে সেই সূর্যের পুনরুদয় হল।

এবারের সংখ্যায় আমরা নানাজনের কলমে লেখা সেই সংগ্রামের কথা তুলে আনার চেষ্টা করেছি। পরিচিত ঘটনাবলীর পাশাপাশি গৃহকোণে দীপ জ্বালানোর মত অজানা কাহিনী শোনাতেও সচেষ্ট থেকেছি।

'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' পর্বের লেখাগুলি পূর্বপ্রকাশিত রচনার পুনর্মুদ্রণ। এ পর্বের প্রথম কবিতাটি লিখেছেন হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক চারপুরুষে পর্তুগিজ-ইন্ডিয়ান হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো। এই সনেটটি এদেশে স্বদেশ প্রেমের প্রথম কবিতা হিসাবে চিহ্নিত। ইংরাজি থেকে বাংলায় ভাষান্তর করেছেন রবীন্দ্রনাথের বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতঃপর 'বন্দেমাতরম' সহ কয়েকটি স্বদেশি গান যার শেষটি হল আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর সঙ্গীত।

এই পর্বে গদ্য রচনা শুরু তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'পলাশির যুদ্ধ'—১৭৫৭-র ২৩ জুনের দিনলিপি। ব্রিটিশদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ার সূচনা পর্বটি মাখনের ভেতর ছুরি চালানোর মত সহজ ভঙ্গীতে তিনি লিখে দিয়েছেন। পরে কয়েকজন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিকথা। শেষে আছে স্বাধীনতার শেষ লড়াই নৌ-বিদ্রোহ নিয়ে দুই বিখ্যাত কলমচির লেখা জলে ও স্থলে লড়াইয়ের দুটি মর্মস্পর্শী বর্ণনা।

একালের কবি-কথাকার-নাট্যকার লিখেছেন কবিতা-আখ্যান-উপন্যাস-নিবন্ধ-গল্প-নাটক। এমনকী প্রকৃত স্বাধীনতা পেতে আজও যে লড়াই চলছে সে কথাও জানিয়েছেন এক অনন্য কথাশিল্পী।

স্বাধীন দেশের নাগরিক, আজকের তরুণ দল, আমাদের বিশ্বাস খোঁজ রাখে না
মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলি দান ...

তারা জানে না সেদিনের আগুনঝরা দিনের কথা, বিদেশি প্রভুদের ভয়াবহ নির্যাতনের ইতিহাস, আমাদের সংগ্রামীদের সেই উদ্ধত প্রভুদের চোখে চোখ রেখে দাঁতে দাঁত চেপে দেশ জননীর সম্মান রক্ষায় বিপুল লড়াইয়ের কথা। যাঁরা মহান আত্মত্যাগী, নির্মম নির্যাতন সয়ে, অনশনে প্রাণ দিয়ে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ে, তির, ধনুক, টাঙি, কী শুধু রিভলবার বা মাস্কেট বন্দুক নিয়ে কামান-বন্দুকধারী আধুনিক সামরিক বাহিনীর মুখোমুখি তাঁদের লড়াইয়ের বীরত্বব্যঞ্জক গাথা, হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, এই প্রজন্মের তরুণদের যে স্বাধীন দেশের নাগরিকের সম্মান দিয়েছে, স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে, তাদের কাছে সেই দুঃসহ দিন ও মহান বীরত্বের খন্ড-কথা শুনিয়ে এ জাতির উজ্জ্বল ইতিহাস জানতে তাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের এই সম্মিলিত প্রয়াস।

এ সংখ্যার আরেকটি বিশেষ আকর্ষণ এবারের ক্রোড়পত্র। একালের বারোজন বিশিষ্ট কথাকার, যাঁরা কিশোর সাহিত্য রচনায় খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকে পরপর বারোটি অধ্যায় লিখে 'গুপ্তধনের গোলকধাঁধায়' উপন্যাসটি শেষ করেছেন। হাতের মুঠোয় যখন পুরো লেখাটি রয়েছে তখন সে প্রসঙ্গে কিছু কথা বলে রসভঙ্গ করব না। তার বদলে বরং বাংলায় ছোটোদের জন্য বারোয়ারি উপন্যাস লেখার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি তুলে ধরি। ১৩৩৬ (১৯২৯) এর বৈশাখে ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগী সম্পাদিত 'মাসপয়লা' মাসিক পত্রের আবির্ভাব হয়। দাম দু পয়সা (তখন ৬৪ পয়সায় ১ টাকার যুগ) সেকালের হিসেবেও বেশ সস্তা। আপন বৈশিষ্টে পত্রিকাখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৩৪৩ (১৯৩৬)-এ 'মাসপয়লা'-য় এক অভিনব পরিকল্পনার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এখানে 'অজানার উজানে' নামে একটি বারোয়ারি প্রকাশ শুরু হয়। প্রতিমাসে এক একজন লেখক এক কিস্তি করে লিখে উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ করেন। লেখক তালিকাটি ছিল যথাক্রমে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন সাহা, সুনির্মল বসু, অখিল নিয়োগী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবিনয় রায়চৌধুরী, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য। 'অজানার উজানে' প্রকাশের পর এমন উদ্যোগ বড়ো একটা নজরে পড়েনি। ১৪০৯ সালে (২০০২) আজ থেকে দু'দশক আগে ঝালাপালা বার্ষিকীতে 'আজব দেশের বন্দিমেয়ে' নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। সেবারের লেখকদের কাউকে এবারের লেখক সূচীতে রাখা হয় নি। এবারের লেখক তালিকায় নতুনদের কলমে নতুন লেখা।

এবারে কথা বন্ধের পালা। স্বাধীনতার প্লাটিনাম জয়ন্তীতে আমাদের পাঠক লেখক বিজ্ঞাপনদাতা ও সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

১৫ আগস্ট ২০২২
কলকাতা-১০৬

ঝালা পালা

সূচিপত্র

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা

হারানো দিন চির নবীন

ক বি তা - গা ন - স্মৃ তি ক থা - গ ল্প - কা হি নি

স্বদেশ আমার	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো অনুবাদ : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর	০৫
বন্দেমাতরম্	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	০৬
একবার বিদায় দে মা যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	পীতাম্বর দাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	০৬ ০৭
সারে জাহাসে আচ্ছা	মহম্মদ ইকবাল	০৭
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	০৮
আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসংগীত	রাম সিং ঠাকুর	০৮

ক থা ও কা হি নি

পলাশীর যুদ্ধ	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	০৯
নির্বাসিতের আত্মকথা	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২
প্রায়শ্চিত্ত	জিতেশচন্দ্র লাহিড়ি	১৫
জালালাবাদের লড়াই শেষে	সুরেশ দে	১৮
তিলক ব্রিজের ওপর	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	২৩
এক জাহাজওলার গল্প	তাপস চৌধুরী	২৬

নতুন লেখা সবুজ লেখা

ক বি তা - উ প ন্যা স - নি ব ন্ধ - কা হি নি - না ট ক- আ খ্যা ন

স্বাধীনতা মানে	পবিত্র সরকার	২৯
দেশব্রতী	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০
স্বাধীনতা	ভবেশ দাশ	৩১
দেশ	আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়	৩১
শহিদ স্মৃতি	কাজী মুরশিদুল আরেফিন	৩২
স্বাধীনতা : স্বাধীনতা	দেবাশিস বসু	৩২

লাল আঁধি	শুভময় মণ্ডল	৩৩
ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের গল্প	শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	৫১
একটি অসমাপ্ত গল্প	গৌতম হাজরা	৫৫
বাঙালির হিম্মত	জাহিরুল হাসান	৫৭
দুন্দুভির বোল, নাকি শালপাতার ডাক	অশোককুমার মিত্র	৬২
শ্রী অরবিন্দ ও ভারতের মুক্তি আন্দোলন	জ্যোতির্ময় দাশ	৬৭
শেষ কোথায় ?	শোভন শেঠ	৭০

কারাগারে কানাইলাল — শুভায়ন বসু — ৭৩
কেউ মনে রাখে নি — স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭৫
কোমাগাতা মারুর কথা — অনন্যা দাশ — ৭৯
মুক্তির মন্দির সোপানতলে — অনির্বাণ রায় — ৮২
জ্যোতি — তনুজা চক্রবর্তী — ৮৮
জালিয়ানওয়ালাবাগ : স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্মম অধ্যায় — অনিরুদ্ধ রাহা — ৯২
ইতিহাসের আড়ালে — চন্দন নাথ — ৯৬
চৌরি চৌরা ও অসহযোগ আন্দোলন — শম্ভু সেন — ১০১
বারদৌলির সর্দার — আবীর গুপ্ত — ১০৬
রক্তনদীর একটি ঘাট — পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় — ১০৮
লবণ সত্যাগ্রহ : মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযান — প্রকৃতি চট্টোপাধ্যায় — ১১৩

পথের ধারের ইতিহাস — জয়া মিত্র — ১১৪
পাহাড়ের কন্যা রানী গাইদালো — দেবাশিস সেন — ১১৮
ফাঁসির মঞ্চে ভাগ্যবান — অর্দ্ধেন্দুশেখর গোস্বামী — ১২২
অগ্নিযুগের বিস্মৃত নায়ক— প্রদ্যোৎকুমার — চন্দন চক্রবর্তী — ১২৯
বিভূতিভূষণ দাসগুপ্তের কাহিনি অবলম্বনে নাটক
সেই মহাবরষার রাঙাজল — উৎপল ঝা — ১৩২
অন্তর্ধান ও আবির্ভাব — শেখর বসু — ১৪১
মৃত্যু নেই — অভিজিৎ সেনগুপ্ত — ১৪৪
তাম্রলিপ্তের শিরদাঁড়া — অবশেষ দাস — ১৫০
বিদায় ঘণ্টা — সমর মিত্র — ১৫৩
দাদাঠাকুর ও দীনেশ ডাকু — ব্রজেন্দ্রনাথ ধর — ১৫৬
বৈরী — শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য — ১৬১
কবাডি কবাডি কবাডি — অমর মিত্র — ১৬৫
দামিনী ই কোহর — অভিজিৎ চৌধুরী — ১৬৮
স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব — দীপঙ্কর গোস্বামী — ১৭০
অমরত্ব — তপন বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৭৩

ক্রোড়পত্র

বা রো য়া রি উ প ন্যা স

গুপ্তধনের গোলকধাঁধায় ১৭৬

লিখেছেন

রাজেশ বসু
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
জয়দীপ চক্রবর্তী
কাবেরী চক্রবর্তী
শিশির বিশ্বাস
রাজা ভট্টাচার্য
দীপ মুখোপাধ্যায়
ছন্দা চট্টোপাধ্যায়
দীপান্বিতা রায়
শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়
সৈকত মুখোপাধ্যায়
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য

স্বদেশ আমার

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিয়ো

স্বদেশ আমার কিংবা জ্যোতির মন্ডলী!
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার; হায়, সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্য পদ! মহিমা কোথায়?
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া যখন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এ শ্রমের এই মাত্র পুরস্কার গনি
তবু শুভধ্যায় লোকে, অভাগা জননী।

অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

‘‘বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।’’
শুভ্র-জ্যোৎস্না পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।

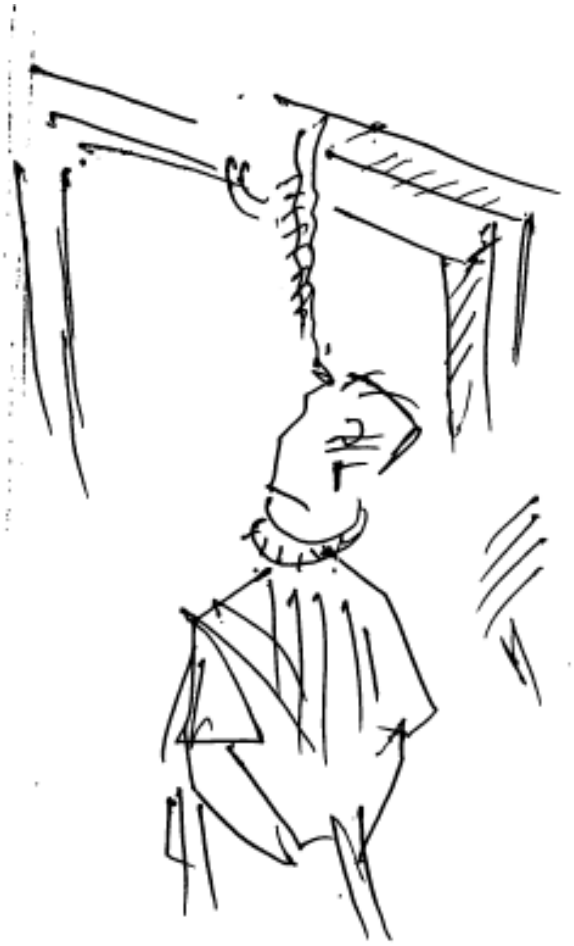

একবার বিদায় দে মা

পীতাম্বর দাস

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসিহাসি পরবো ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী
কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে (মাগো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম আরেক ইংলন্ডবাসী
হাতে যদি থাকতো ছোরা, তোর খুদি কি পড়তো ধরা (মাগো)
রক্তমাংসে এক করিতাম দেখতো জগতবাসী।
শনিবার বেলা দশটার পরে, জজকোর্টেতে লোক না ধরে
(মাগো)
হলো অভিরামের দ্বীপ-চালান মা খুদিরামের ফাঁসি
বারো লক্ষ তেত্রিশকোটি রইল মা তোর বেটাবেটি (মাগো)
তাদের নিয়ে ঘর করিস মা মোদের করিস দাসী।
দশমাস দশদিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে (মাগো)
তখন যদি না চিনতে পারিস, দেখবি গলায় ফাঁসি।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবেএকলা চলো রে।
একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্ত মাখা চরণতলে একলা দলো রে।।

যদি আলো না ধরে, তবে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।।

সারে জাঁহাসে আচ্ছা

মহম্মদ ইকবাল

সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা
হাম বুলবুলেঁ হ্যায় ইসকি
ইয়ে গুলিস্তাঁ হামারা হামারা।
গুর বত মেঁ হ্যাঁ অগর হাম
রহতা হ্যাঁ দিল ওয়াতন মেঁ
সমঝো ওহি হামেঁ ভি
দিল হ্যাঁ জাঁহা হামারা।
পরবত ওহ সব সে উঁচা
হামসায়া আসমান কা
ওহ সানতারি হামারা
ওহ পাসবাঁ হামারা।
গোদিমেঁ খেলতি হ্যাঁ
ইসকি হাজারোঁ নদীয়া
গুলশন হ্যায় জিনকে দমসে
রশক্-এ-জানাঁ হামারা।
মজহব নঁহি সিখাতা আপস মে ব্যার রখনা
হিন্দী হ্যায় হম, হিন্দী হ্যায় হম, হিন্দী হ্যায় হম
ওয়াতন হ্যায়।
হিন্দোস্ত্যাঁ হামারা।

কারার ঐ লৌহকপাট

কাজী নজরুল ইসলাম

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট,
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।

ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ,
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।
কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে পেল কর রে লোপাট,
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক, কে সে রাজা,
কে দেয় সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি,
ভগবান পরবে ফাঁসি,
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট,
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

ওরে ও পাগলা ভোলা
দে রে দে প্রলয় দোলা,
গারদগুলা জোরসে ধরে হ্যাঁচকা টানে,
মার হাঁক হায়দারী হাঁক
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট,
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ বেদী।
নাচে ওই কালবোশাখী
কাটাবি কাল বসে কি?
দেরে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি
লাথি মার ভাঙ্গরে তালা,
যত সব বন্দীশালায়
আগুন-জ্বালা,আগুন জ্বালা,
ফেল উপাড়ি।

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল করে রে লোপাট,
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।

আজাদ হিন্দ ফৌজের রণসংগীত

রাম সিং ঠাকুর

কদম কদম বঢায়ে জা,
খুশীকে গীত গায়ে জা।
য়হ জিন্দগী হৈ কৌমকী
তো কৌম পর লুটায়ে জা।।
তূঁ শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়,
মরণ সে ফির ভী তূঁ ন ডর।
আসমান তক্ উঠাকে সর,
জোশে বতন বঢায়ে জা।
তেরী হিম্মত বঢ়তী রহে,
খুদা তেরী শুনতা রহে।
জো সামনে তেরে চঢ়ে,
তো খাঁকমে মিলায়ে জা।।
চল দিল্লী পুকারকে,
কৌমী নিশান সম্হালকে।
লাল কিল্লে পর গাড়্কে,
লহরায়ে জা, লহরায়ে জা।।

পলাশীর যুদ্ধ

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

পরদিন বৃহস্পতিবার ২৩শে জুন ১৭৫৭ সাল।

ভোর হ'তে-না-হতেই দূর থেকে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল। তখনো ভালো ক'রে সকলের ঘুম ভাঙেনি। ক্লাইভ শিকারবাড়ির ছাদে উঠে দূরবীন কষলেন। দেখলেন, নবাবের সৈন্যরা ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসছে। ক্লাইভের বুকটা কি একটু কেঁপে উঠল? তাঁর সমস্ত সৈন্য মিলে নবাবের সৈন্যের কুড়ি ভাগের একভাগও যে হবে না।

ক্লাইভ শিকারবাড়ি ছেড়ে নেমে এলেন। আমবাগান থেকে সৈন্য বের ক'রে এনে বাগানের পাঁচিলের সামনেই যুদ্ধের জন্যে সাজিয়ে ফেললেন। মাঝখানে রইল গোরারা। তাদের ডাইনে- বাঁয়ে তিন-তিনটে ক'রে ছ'টা কামান। শাদামুখো লালকোর্তা গোরাদের দু পাশে দাঁড়াল কালো তেলেঙ্গি সেপাই আর দিশি লাল-পল্টন। ইংরেজদেরই হাতে তাদের হাল-কায়দার যুদ্ধবিদ্যা শেখা। সামান্য কিছু সৈন্য রসদপত্র পাহারা দেবার জন্যে আমবাগানের ভিতর র'য়ে গেল।

মেজর জেম্‌স কিল্‌প্যাটরিক, মেজর আরচিবল্ড গ্রান্ট, মেজর আয়ার কুট, ক্যাপ্টেন জর্জ গপ্‌—এই চার জন ইংরেজ অফিসার সেনা চালাবার জন্যে রইলেন। ক্লাইভ নিজে তো সর্বাধ্যক্ষ আছেনই।

তাঁদের বাঁয়ে গঙ্গা। তার উপরেই সেই শিকারবাড়ি। আপাতত সেটা ইংরেজ ফৌজ-এর হেড্‌ কোয়ার্টার্স।

নবাবের পক্ষে ইংরেজদের সামনেই দু-শো গজ তফাতে একটা ছোট পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সাঁফ্রে ব'লে এক ফরাসি সেনাপুরুষ। সঙ্গে তাঁর গোটা পঁয়তাল্লিশেক ফরাসি গোলন্দাজ আর চারটে ছোট-ছোট কামান। তারই ঠিক পিছনে মীর মদনের কর্তৃত্বে নবাবের একদল সৈন্য।

মীর মদনের বাঁ-পাশে এক প্রকাণ্ড জায়গা ঘিরে কাশ্মীরি সেনাপতি মোহনলাল। সবসুদ্ধ পাঁচ হাজার ঘোড়সওয়ার আর সাত হাজার পায়দল জঙ্গী সেইখানে। নবাবের বাকি সৈন্যরা রইল একটা ফেলে দেওয়া ইটখোলার পাড়ের এক উঁচু ঢিপির উপর।

এ ছাড়া ইংরেজদের বাঁ-পাশে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন রায় দুর্লভ, ইয়ার লুত্‌ফ খাঁ আর মীর জাফর। তাঁদের দক্ষিণ দিকে পলাশিগ্রাম আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে।

ইংরেজদের সব মিলিয়ে ৯৫০টি গোরা, ২১০০ সেপাই, ৮টা কামান আর দুটো বড় তোপ। নবাবের পক্ষে জঙ্গীতে আর ঘোড়সওয়ারে ৫০ হাজার সৈন্য, ৫৩টা বড়-বড় কামান। নবাবের সেনানীদের কী বিচিত্র চেহারা। কী রং-বেরংয়ের সাজ-পোশাক। নবাবি-ফৌজে সব প্রদেশেরই লোক দেখা যাচ্ছে।

সকাল আটটায় লড়াই শুরু হ'য়ে গেল। প্রথমেই কামান দাগলেন

সাঁফ্রে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজদের তিরিশ জন লোক ঘায়েল। ক্লাইভ দেখলেন তাঁদের এক-একটার বদলে নবাবের দশ-দশটা ক'রে লোক মরলেও লড়াই জেতা যাবে না। দু-দণ্ডে তাঁরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তিনি আর বৃথা বলক্ষয় না ক'রে, আস্তে-আস্তে পিছন হ'টে সকলকে আবার আমবাগানের ভিতর নিয়ে গিয়ে পুরলেন।

ইংরেজদের পিছন হঠতে দেখে নবাবের সৈন্যরা একটু এগিয়ে গেল। কিন্তু প্রাণপণ ক'রে তোপ ছেড়ে গুলি চালিয়েও ইংরেজদের কিছু ক্ষতি করতে পারল না। সব গোলা-গুলিই ইংরেজ-ফৌজের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে কেবল আমবাগানের ভালো-ভালো কলমের গাছগুলোর ডাল ভেঙে দিয়ে বাইরে ছিট্‌কিয়ে পড়তে লাগল।

এদিকে আমবাগানে ঢুকে পাঁচিলের মধ্যে খানিকটা ক'রে গর্ত কেটে তারি ভিতরে কামানের মুখনল পুরে ইংরেজরা উবু হ'য়ে ব'সে তোপ ছুঁড়তে লাগলেন। সে-তোপের কী আশ্চর্য টিপ। কী ভীষণ তার মারণশক্তি। নবাবের দিকে অগুন্তি লোক মারা পড়ল। অনেকগুলো অযত্নে-রাখা বারুদের গাড়ির উপর গোলা পড়ায় সেগুলো দেখতে-দেখতে হাওয়া হয়ে উড়ে গেল। বেলা এগারোটা পর্যন্ত দু-পক্ষই কেবল এন্তার কামান দেগেই চললেন। শুধু পাঁয়তারা কষা, লড়াইয়ের কিছুই মীমাংসা হ'ল না। সে-পর্যন্ত কারো হার নয়, কারো জিত নয়।

ক্লাইভ ভাবলেন ঐ রকম ক'রে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারলে রাত্তিরে নবাবি ফৌজকে একবার তাড়া ক'রে দেখবেন। রাত্তিরে দিশি ফৌজ পারত-পক্ষে লড়াই করতে চায় না। রাত্তিরের যুদ্ধে তারা বিভীষিকা দেখে। দক্ষিণ দেশে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ক্লাইভের সেটা ভালো ক'রেই জানা ছিল।

এগারোটার পর হঠাৎ এক পশলা খুব জোর বৃষ্টি হেনে এল। আধ-ঘণ্টা ধ'রে অনবরত বৃষ্টিপাত হওয়ায় সমস্ত মাঠটা কাদায়-কাদায় একশা। বৃষ্টি থামলে ইংরেজরা ফরাসিদের গোলার প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নবাবের দিক থেকে আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কি, নবাবের দিকের বারুদের গাড়ির উপর কোনো ঢাকা ছিল না। গোলমালে তেরপল খুঁজে বের করতে-করতেই সমস্ত বারুদ একেবারে ভিজে ঢোল।

বৃষ্টির বেগ থামতে নবাবের সেনাপতি মীর মদন ভাবলেন ইংরেজদেরও বোধ হয় ঐ একই দশা। তাঁদেরও বারুদ বোধ হয় কাজের বাইরে। এই-না ভেবে তিনি হাজার-খানেক সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের দিকে তেড়ে গেলেন। মনে করলেন ধারে যদি-বা না কাটে, ভারে তো নিশ্চয়ই কাটবে। ওদিকে ইংরেজদের বারুদের গাড়ি বেশ সুন্দর ক'রে ঢাকা দিয়ে সাজানো ছিল। তার কিছুই হয়নি।

নবাবের সৈন্যদের এগিয়ে আসতে দেখে ইংরেজরা আবার মুহুর্মুহু গোলাগুলি চালালেন। তার চোটে নবাবের পক্ষের মীর মদন, মীর মদনের জামাই বদ্রী আলী খাঁ, নৌবেসিং হাজারি প্রভৃতি বড়-বড় সেনাপতিরা আর অনেক ছোটখাটো সেনাধ্যক্ষও যুদ্ধক্ষেত্রেই হত হলেন। নবাবি-সেনারা ক্রমে-ক্রমে পিছু হঠতে লাগল। হঠতে-হঠতে একেবারে ছাউনির মুখে। তারপর সেখানকার সুড়ঙ্গ-কাটা খাতের ভিতরে গিয়ে লুকোল। কেবল নিজেদের জায়গায় ঘাঁটি আগলে র'য়ে গেলেন ফরাসি সাঁফ্রে আর তাঁর সঙ্গীরা।

আমবাগানের ডান দিকে মীর জাফর, ইয়ার লুত্‌ফ, রায় দুর্লভ কলের মতন হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। নড়ন-চড়ন কিছুই না, যেন মজা ক'রে তামাশা দেখছেন। ক্লাইভ তাঁদেরও বাদ দিলেন না। তাঁদের মতলব ঠিক যে কী, তা বুঝতে না পেরে তাঁদেরও উপর গুলি চালালেন, যাতে তাঁরা বেশি কাছে এগিয়ে আসতে না পারেন।

পরে ইংরেজদের বলতে শোনা গেছে মীর জাফর আর তাঁর দুই সঙ্গী দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, কোন্ পক্ষ শেষ-মেশ জেতেন। যদি দেখতেন ইংরেজরা হারছেন, তাহলে শেষ-মুহূর্তে তাঁদের ঘাড়ে লাফিয়ে প'ড়ে যুদ্ধজয়ের বাহাদুরিটা নিজেরাই দাবি করতেন। বিশ্বাসঘাতকদের ভাগ্যই ঐরকম। কেউই তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। একেই বলে, যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।

নবাবের পক্ষের ঐ তিনজন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের বাদ দিয়েও তাঁর যা সৈন্যসামন্ত ছিল তাঁরা যদি স্থির-ধীর হ'য়ে বুদ্ধি ক'রে গুছিয়ে-গাছিয়ে যুদ্ধ করতেন, তাহ'লে ইংরেজদের সামান্য ঐ ক'টা লোককে পিষে মেরে ফেলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়াটা তাঁদের পক্ষে একটুও অসম্ভব কিছু ছিল না। কিন্তু কি হ'ত না-হ'ত তা ভেবে এখন আর কি লাভ? যেটা ঘটেছিল সেটা তো আর ফিরবে না? আর সেইটেই তো হ'ল ইতিহাস।

যুদ্ধে সেনাপতি মীর মদনের মৃত্যু হয়েছে শুনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুষ্‌ড়ে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। উঠে-প'ড়ে আর যে কিছু করা, তা নয়। আর কোনো চেষ্টাই তিনি কিছু করলেন না। শুধু মীর জাফরকে ডাকিয়ে এনে নিজের পাগড়িটা খুলে তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে বললেন, এখন আমার প্রাণ-মান তোমারই হাতে। রাখলে তুমিই রাখতে পারো, মারলে তুমিই মারতে পারো।

অবিশ্বাসী মীর জাফর কোরান ছুঁয়ে শপথ করলেন তিনি নবাবকে রক্ষা করবেন, ইংরেজদের সঙ্গে ভালো ক'রেই ল'ড়ে যাবেন। কিন্তু সেদিন আর না। সেদিনকার মতন লড়াই বন্ধ থাকে। সকলে এখন চাউনিতে ফিরে যাক। পরদিন সকালে ইংরেজদের একবার ভালো ক'রে এক-হাত দেখে নেওয়া যাবে। মীর জাফর এই পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু স্বস্থানে ফিরে গিয়েই মীর জাফর ক্লাইভকে এক চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলেন আমবাগান থেকে বেরিয়ে পড়ে নবাবের সৈন্যদের তাড়া করবার সেই উপযুক্ত সময়। ইংরেজদের ভাগ্যিই ভালো যে, সে-চিঠি ক্লাইভের হাতে এসে পড়ল পলাশির যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবার পর।

এক বিশ্বাসঘাতক যেতে আর-এক বিশ্বাসঘাতক এলেন। রায় দুর্লভও নবাবকে সেদিনকার মতন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিতে পরামর্শ দিলেন। উপরন্তু তিনি আরো বললেন, নবাবের এখন স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে থাকার কোনো দরকার নেই। রাত্তিরে ঘাঁটি আগ্‌লাবার জন্যে সেনাপতিরাই তো যথেষ্ট।

সেনাপতি মোহনলাল কিন্তু মীর জাফরের উপদেশ মতো লড়াই